প্রঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (১৫)

উঃ • প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, আছেন। যিনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেই সমুদ্রগুপ্তও পরবর্তী মানুষের কাছে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতবাসীর মনে, ভারতের কিংবদন্তী ও লোককথায় সঞ্জীবিত হয়ে আছেন। এর কারন বিশ্লেষনে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এর বলেছেন যে— ভিত যে প্রথম গড়ে তাকে কেউ মনে রাখেনা মানুষ মুগ্ধ হয় পরবর্তী কালের নির্মিত সৌধচূড়া দেখে। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও সাংস্কৃতিক নবজাগরন দ্বারা চিহ্নিত নতুন যুগের পুরোধা। তাই স্থান হয়েছিল অসংখ্য মানুষের অন্তরে। সমুদ্রগুপ্তকে যদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার কর্তা বলা যায় তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে এই সাম্রাজ্যের সংগঠক বলা চলে। সাম্রাজ্যস্থাপন যেমন কঠিন সাম্রাজ্যকে স্থায়ী সংগঠিত করাও অনুরূপ কঠিন। সেদিক দিয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের পরিপূরক।

• তিনি ঠিক কোন বছর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা ~~যায়নি~~ না গেলেও আনুমানিক ৩৭৫ থেকে ৩৮০ খ্রীঃ মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে তিনি সিংহাসনে বসেন। কারন সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় শেষ উল্লেখিত বছর ৩৭৫ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা যা তার রাজত্বের সূচনা পর্বের বলে ধরা হয় তাতে উল্লেখিত বছর ৩৮০ খ্রীঃ। তখনকার দিনে মূলত পিতার সিংহাসনের উপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার ছিল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অনুমেয়, নিজদক্ষতা, ও রাজকার্যে পারদর্শিতার কারনে তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের তুলনায় এগিয়েছিলেন বলেই সম্ভবত পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র না হলেও সিংহাসনে আরোহন করতে পেরেছিলেন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক নাট্যকার বিশাখদত্ত রচিত 'দেবী চন্দ্রগুপ্তম' নাটকের একটি

ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন —— এখানে দেখা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী ধ্রুবা দেবীকে বিবাহ করে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। রামগুপ্তের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রার আবিষ্কার এই ধারনাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তবে একথাও ঠিক যে তৎকালীন সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর পানিগ্রহন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া প্রায় ২০০ বছর পরে লিখিত এই নাটকের বিষয়বস্তুকে ঐতিহাসিক সত্যতার বিচারে মেনে নেওয়া যায় না।

• দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মূলত আলোচনা করা যেতে পারে। ① তার যুদ্ধনীতি তথা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, এবং ② সাম্রাজ্যের সংহতি ও সংস্কৃতি। প্রথমেই বলা যেতে পারে সংহতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি যে প্রসংশার দাবী রাখতে পারেন সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। তাঁর সাম্রাজ্য সীমা পূর্বে কামরূপ (আসাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলা বাহুল্য কামরূপ রাজ সমুদ্রবর্মন ও তার পুত্র বলবর্মন তার অধীনতা মেনে নেন। অন্য দিকে তার রাজ্যের সীমানা (পশ্চিম দিকে) যমুনা নদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত তার দুইটি সিল ও মুদ্রা আমাদের এই ধারনাকে সমর্থন করে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় এই অংশে মূলত সমুদ্রগুপ্ত যে রাজ্যের সীমানার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, তার সময়েও তা প্রায় একই রকম ছিল। অন্যদিকে হিউ-য়েন সাং তার সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

• দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে মূলত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের নীতিকেই অনুসরন করেছেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই ~~বৈবাহিক~~ বৈবাহিক সম্বন্ধকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি কূটনীতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিজে নাগা বংশীয় রাজকুমারী কুবের নাগাকে বিবাহ করেন। তাছাড়া তিনি বর্তমান ⟶ বেরার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত বকাটক রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সাথে তার কন্যা প্রভাবতী দেবীর বিবাহ দেন। এছাড়া কদম্ববংশীয় রাজা কাকুৎস্থ বর্মনের একটি লিপি থেকে ⟶ জানা যায় যে তিনি গুপ্ত ⟶ রাজপরিবারে কন্যাদান করেছিলেন। খুব সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্রের সঙ্গে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারনা। এই সমস্ত শক্তিশালী রাজবংশের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই তার পারিবারিক শক্তি

Scanned with CamScanner

বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনেকে মনে করেন শকদের সঙ্গে তার সংগ্রামে বকাটক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল, তবে ঐতিহাসিক গয়াল একথা স্বীকার করেন না। বকাটকদের তেমন কোন শক্তি ছিলনা, ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অন্তত শকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বকাটকদের তেমন কোন সহযোগিতা পাননি বলেই তার ধারনা। তথাপি একথা স্বীকার্য যে বকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর কন্যা প্রভাবতী দেবীর সাহায্যে বকাটক রাজ্যের উপর গুপ্তদের প্রভাব অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং এই সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে শক্তিশালী হবার পথে সহায়তা দান করেছিল বলা যায়।

• দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের জীবনের সামরিক অভিযানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি হল শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হওয়া। শকরা মূলত গুজরাট (সৌরাষ্ট্র) পূর্বমালব প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে মালবের উপর শকদের আধিপত্য বিস্তার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খুশি মনে মেনে নেননি। আর তাই তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত অধীনস্থ কতকগুলি রাজ্যের সাহায্যে তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হন, এই যুদ্ধে শকদের পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নিজ রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি ও পিতার অপূর্ন ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করলেও ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করেন, ড: মজুমদারের মতে, শকদের এই পরাজয়ের ফলে গুপ্তরা ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশের বানিজ্যকে নিয়ন্ত্রন করার সুযোগ পায়। স্বভাবতই বানিজ্য সমৃদ্ধ এই অঞ্চল দখলের ফলে গুপ্তদের অর্থনৈতিক শক্তি বহুগুন বৃদ্ধি পায়।

• শকদের সাথে তার সংঘর্ষের কাহিনী সম্পর্কে জানতে মূলত মন্ত্রী বীরসেনের উদয়গিরি লেখ এবং সেনাপতি আম্র কার্দবের সাচী লেখ আমাদের সাহায্য করে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এত বড় যুদ্ধ প্রভৃতি খুব কমই ঘটে ছিল। এই যুদ্ধের ফলে গুপ্তদের সামরিক শক্তি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনই গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব বর্ধিত হয় বহুগুনে। আসলে এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলের উপরে যেমন নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে ঠিক তেমনই ভারত-মহাসাগরের কতগুলি দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্তদের আধিপত্য। এই অঞ্চল যেহেতু তৎকালে বৈদেশিক বানিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করত সেই কারনেই ভারত-চীন ভারত-রোম ও ইউরোপ তথা এশিয়ার প্রায় সমগ্র বানিজ্য পরিচালনের অধিকার লাভ করে গুপ্তরা। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশাল অঞ্চলের বানিজ্য নিয়ন্ত্রন করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য তাঁর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করতে সক্ষম হন। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যুদ্ধের ফলেই ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিদেশীদের অন্তিম চিহ্নটুকু মুছে দেওয়া হয়েছিল।

• দিল্লীর কাছে মেহেরৌলিতে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের লেখ থেকে জানা যায় যে, ... বঙ্গিক দেশ জয়ের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় হয়ত এই যুদ্ধযাত্রা সম্ভবপর হয়েছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, উত্তরগুপ্তের এক চন্দ্র রাজার নাম এই ধারনাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ অঞ্চলে তখন মূলত কুষানরা বসবাস করত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির স্বার্থে হয়ত এই যুদ্ধযাত্রা প্রয়োজনীয় ছিল, এছাড়াও উক্ত লিপিতে বঙ্গ ও সমতট সীমান্তবর্তী কিছু রাজ্যের উপর পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের ঘটনারও উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে হয়ত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারনেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছিল। (15)

• দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে সুশাসক ছিলেন এবং প্রজাহিতৈষী যে তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ফা-হিয়েনের বিবরন থেকে আমরা তার প্রমান পাই। ফা-হিয়েন আরো উল্লেখ করেছেন যে সাম্রাজ্য স্থাপন যেমন কঠিন কাজ সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করনের জন্য সু সংগঠন ও সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও কঠিন কাজ। এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের মত উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল তার। তার শাসন
(15) ব্যবস্থা ছিল উদার ও জনকল্যাণ মূলক। স্মিথের মতে, "Probably India has never been governed better after the oriental manner than it was during the reign of Vikramaditya".

• তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সামরিক বিজয় বা দূরদর্শী শাসক কিংবা বাস্তব কূটনীতিতে দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করলেই সব কথা বলা হয়না, কেননা একই সাথে তিনি যেমন দক্ষ শাসক তেমনই শিল্প ও সাহিত্যের গভীর অনুরাগীও
(2) প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত মনীষীদের সমাবেশ তার রাজসভায় ঘটেছিল। কালিদাসের মত কালজয়ী ব্যক্তিত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির, সাহিত্যিক বররুচি ও বহুমুখী প্রতিভাধর অমু প্রমুখ প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বরা তার রাজসভাকে অলংকৃত করেছিলেন। কাজেই চিকিৎসা শাস্ত্র, গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁর সময়কাল গুপ্তযুগের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে।

3h → 10 Min

Scanned with CamScanner